بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মুমিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ মোতাবেক ২০ তাবূক, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আহযাব বা পরিখার যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সীরাত বা জীবনচরিতের বরাতে আলোচনা হচ্ছিল। গত খুতবায় আমি খাবারে বরকত সৃষ্টির অলৌকিক নিদর্শনের কথা বর্ণনা করেছিলাম। একইভাবে খেজুরে বরকত সৃষ্টির ঘটনাও পাওয়া যায়। লিখিত আছে, সামান্য খেজুর পরিখা খননকারী সবাই খেয়েছেন। এর বিশদ বর্ণনা হলো, পরিখার যুদ্ধের সময়ের একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, হযরত বশীর বিন সা'দ (রা.)-র কন্যা বর্ণনা করেন,

আমার মা আমরা বিনতে রওয়াহা (রা.) আমার কাপড়ে সামান্য কিছু খেজুর দিয়ে বলেন, হে কন্যা! এগুলো তোমার পিতা এবং মামাকে দিয়ে এসো। আর বলবে, এগুলো আপনাদের সকালের খাবার। তিনি বলেন, আমি এই খেজুরগুলো নিয়ে রওয়ানা হই এবং আমার পিতা ও মামাকে খুঁজতে খুঁজতে মহানবী (সা.)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করি, তখন মহানবী (সা.) বলেন, হে মেয়ে! তোমার কাছে এগুলো কী? আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এগুলো হলো খেজুর, যা আমার মা আমার পিতা বশীর বিন সা'দ এবং আমার মামা আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা-র জন্য পাঠিয়েছেন। মহানবী (সা.) বলেন, এগুলো নিয়ে আসো এবং আমাকে দিয়ে দাও। আমি সেই খেজুরগুলো মহানবী (সা.)-এর দুহাতে তুলে দেই। মহানবী (সা.) এই খেজুরগুলোকে একটি কাপড়ের ওপরে বিছিয়ে দেন এবং এরপর সেগুলোকে আরেকটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দেন। তারপর এক ব্যক্তিকে বলেন, মানুষজনকে খাবারের জন্য ডেকে আনো। অতএব, সকল পরিখা খননকারী জড়ো হয়ে যায় আর সেই খেজুর খেতে আরম্ভ করে কিন্তু সেই খেজুরগুলো বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি যখন সবার খাওয়া শেষ হয়ে যায় তখনও খেজুর কাপড়ের প্রান্ত দিয়ে নীচে পড়ছিল।

খাবারে বরকত সৃষ্টির আরও কিছু ঘটনা রয়েছে। উবায়দুল্লাহ্ বিন আবি বুরদা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি বর্ণনা করেন, উম্মে আমের আশহালিয়া (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে একটি পাত্র প্রেরণ করেন যাতে 'হ্যায়স' ছিল। 'হ্যায়স' হলো এমন খাবার যা খেজুর, ঘি এবং পনিরের মিশ্রণে প্রস্তুত করা হয়। মহানবী (সা.) নিজের তাঁবুতে হযরত উম্মে সালামা (রা.)-র কাছে ছিলেন। হযরত উম্মে সালামা (রা.) নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী তা থেকে খান। এরপর আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) সেই পাত্রটি নিয়ে বাহিরে চলে যান। আর মহানবী (সা.)-এর ঘোষক খাবারের জন্য আহ্বান করেন।

তখন পরিখা খননকারীরা তা থেকে খায়, এমনকি এর দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। অথচ সেই খাবার পূর্বের মতোই (অবশিষ্ট) ছিল, যেন তা থেকে কিছুই হ্রাস পায় নি।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) সালেক (সাধক)-এর মর্যাদার উল্লেখ করতে গিয়ে, যে অবস্থায় সে খোদার এতটা নৈকট্য অর্জন করে নেয় যেমনটি আগুন লোহার রংকে নিজের মাঝে এমনভাবে লুকিয়ে ফেলে যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে অগ্নি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না, আর যেটিকে 'লিকা'র (বা খোদার সাথে সাক্ষাতের) অবস্থা বলা হয়– তার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, [তিনি (আ.) সালেক-এর এবং যারা 'লিকা'র মর্যাদা লাভ করে তাদের সংজ্ঞা বর্ণনা করছেন; এরপর তিনি বলেন,] 'লিকা'র এই মর্যাদায় উন্নীত মানুষের দ্বারা কখনো কখনো এমনসব কাজ সাধিত হয় যা মানবীয় সামর্থ্যের অতীত বলে মনে হয় আর নিজের মাঝে এক ঐশী শক্তির বৈশিষ্ট্য রাখে। যেভাবে আমাদের নেতা ও মনিব সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.) বদরের যুদ্ধে এক মুষ্টি কঙ্কর কাফিরদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করেন আর সেই মুষ্টি কোনো দোয়ার মাধ্যমে নয়, বরং স্বয়ং নিজের আধ্যাত্মিক শক্তিতে (বলীয়ান হয়ে) নিক্ষেপ করেন। কিন্তু সেই মুষ্টি ঐশী শক্তি প্রদর্শন করেছে আর বিরোধী সেনাদের ওপর তার এমন অসাধারণ প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে যে, তাদের মাঝে কেউ এমন ছিল না যার চোখে এর প্রভাব পড়ে নি। তারা সবাই অন্ধের ন্যায় হয়ে যায় আর এমন আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠা তাদের মাঝে সৃষ্টি হয় যে, তারা মাতালের ন্যায় পালাতে আরম্ভ করে। আর এরূপ আরও অনেক অলৌকিক নিদর্শন রয়েছে যা কেবল ব্যক্তিগত ক্ষমতাবলে মহানবী (সা.) দেখিয়েছেন, যেগুলোর সাথে কোনো দোয়া ছিল না। কোনো কোনো সময় সামান্য পানি যা কেবল একটি পেয়ালায় ছিল, নিজের আঙুল সেই পানিতে প্রবেশ করানোর মাধ্যমে তার পরিমাণ এত বৃদ্ধি করে দিয়েছেন যে, পুরো সেনাবাহিনী এমনকি উট ও ঘোড়া পর্যন্ত সেই পানি পান করার পরও তার পরিমাণ ততটুকুই রয়ে যায়। আবার কখনো কখনো দুচারটি রুটিতে হাত রাখার ফলে হাজার হাজার ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্তকে তা দ্বারা পরিতৃপ্ত করে দিয়েছেন। আবার কখনো কখনো সামান্য দুধকে নিজের অধর দ্বারা বরকতমণ্ডিত করে এক পুরো দলের পেট তা দ্বারা পূর্ণ করে দিয়েছেন। আবার কখনো কখনো লোনা পানির (অর্থাৎ লবণাক্ত পানির কুপে) নিজের মুখের লালা মিশিয়ে সেটিকে একান্ত সুমিষ্ট করে দিয়েছেন। আর কখনো কখনো গুরুতর আহতদের বা আঘাতপ্রাপ্তদের ওপর নিজের হাত বুলিয়ে তাদেরকে সুস্থ করে দেন। কখনো কখনো যেসব চোখের অক্ষিগোলক যুদ্ধের কোনো আঘাতে বাহিরে বেরিয়ে এসেছিল, নিজের হাতের বরকতে পুনরায় ঠিক করে দেন। এমনই আরও অনেক কাজ তিনি নিজের ব্যক্তিগত ক্ষমতাবলে করেছেন যার সাথে একটি সুপ্ত ঐশী শক্তি মিশ্রিত ছিল।"

পরিখা খননের সময় মুনাফিক ও মুমিনদের অবস্থার বিবরণও রয়েছে। এর বিশদ বিবরণ হলো, ইবনে ইসহাক লিখেছেন, অনেক মুনাফিক মহানবী (সা.) ও মুসলমানদের কাজে অংশগ্রহণের

ক্ষেত্রে আলস্য প্রদর্শন করে আর তারা সামান্য কাজ করত এবং মহানবী (সা.)-কে না জানিয়ে এবং অনুমতি না নিয়েই বাড়িতে চলে যেতো। অথচ অপরদিকে মুসলমানদের মধ্য থেকে কারও যখন কোনো প্রয়োজন দেখা দিতো তখন তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করতেন আর যাওয়ার অনুমতি চাইতেন। এটি ছিল মুমিনদের অবস্থা। অর্থাৎ মুনাফিকরা জিজ্ঞেস না করেই চলে যেতো আর মুমিনরা জিজ্ঞেস করে যেতেন। তখন মহানবী (সা.) মুমিনদেরকে (যাওয়ার) অনুমতি প্রদান করতেন। আর তারাও নিজেদের প্রয়োজন শেষ হতেই ফিরে আসতেন।

মহানবী (সা.)-এর যুদ্ধের প্রস্তুতির আরও বিশদ বিবরণ রয়েছে। এ বিষয়ে লেখা আছে, বিভিন্ন রেওয়ায়েত অনুযায়ী আবু সুফিয়ানের সেনাবাহিনীর আগমনের তিন দিন পূর্বেই পরিখা প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিখা খননকারী শিশু-কিশোর ও যুবকদের সেসব দুর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয় যেখানে নারীদেরকে সুরক্ষার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছিল। যদিও যাদের বয়স ১৫ বছর ছিল তাদেরকে এই অনুমতি দেওয়া হয় যে, তারা চাইলে এখানে অবস্থান করতে পারে অথবা চাইলে দুর্গে ফিরে যেতে পারে। এমন যেসব যুবককে যুদ্ধে অংশ নেয়ার অনুমতি দেওয়া হয় তাদের মাঝে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর, হযরত যায়েদ বিন সাবেত, হযরত আবু সাঈদ খুদরী আর হযরত বারা বিন আযেব (রা.) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

ইবনে হিশাম-এর ভাষ্য অনুযায়ী মহানবী (সা.) মদীনায় ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। তিনি (সা.) সালাহ্ পাহাড়ের সামনে শিবির স্থাপন করেন। সালাহ্ মদীনার উত্তর দিকের একটি পাহাড় যা বর্তমানে মসজিদে নববী থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরত্বে অবস্থিত বলে বর্ণনা করা হয়। মহানবী (সা.) এই পাহাড়টিকে নিজের পেছনদিকে রাখেন আর পরিখাকে সামনে রাখেন এবং তাঁর (সা.) সেনাবাহিনীও সেখানে ছিল। তাঁর (সা.) জন্য চামড়ার তাঁবু খাটানো হয়। মুহাজিরদের পতাকা হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে আর আনসারের পতাকা হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-র হাতে তুলে দেওয়া হয়। মুসলমানদের সংখ্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন। কারও মতে এই সংখ্যা ৯০০'র অধিক ছিল না। আবার কারও মতে এই সংখ্যা ছিল ৭০০। কারও মতে এই সংখ্যা ছিল দুহাজার এবং কারও মতে তিন হাজার ছিল। (মুসলমানদের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে পৃথক পৃথক বিবরণ রয়েছে।) ঐতিহাসিকদের এ সংখ্যা বর্ণনার ক্ষেত্রে অনেক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। তারা যখন সংখ্যার বিষয়টি উল্লেখ করেন তখন একটি বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দিয়ে অন্যান্য বর্ণনাকে ভুল আখ্যায়িত করেন। কিন্তু হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) পরম বিচক্ষণতার সাথে কাউকে ভুল বলার পরিবর্তে এসব রেওয়ায়েতের মাঝে সমন্বয় সাধন করে বর্ণনা করেন, এগুলো পরস্পর একটি অপরটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। (তা) কীভাবে? তিনি (রা.) বলেন,

এ সময় মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে চরম মতভেদ রয়েছে। অনেক মানুষ এই সৈন্যসংখ্যা তিন হাজার লিখেছেন, কেউ কেউ বারো-তেরোশ আবার অনেকে সাতশ লিখেছেন। এটি এত বড়ো অসঙ্গতি যে, বাহ্যতঃ এর ব্যাখ্যা করা খুবই কঠিন বা দুরূহ মনে হয়, তাই ঐতিহাসিকগণ এর সমাধান করতে সক্ষম হন নি। কিন্তু আমি এর বাস্তবতা অনুধাবন করেছি, আর তা হলো– তিন ধরনের রেওয়ায়েতই সঠিক। এটি বলা হয়েছে যে, উহুদের যুদ্ধ থেকে মুনাফিকদের প্রত্যাবর্তনের পর মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল কেবল সাতশ। এর কেবল দুবছর পর আহযাবের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এ সময়ে বড়ো কোনো গোত্র ইসলাম (ধর্ম) গ্রহণ করে মদীনায় এসে বসতি স্থাপন করে নি। কাজেই, সাতশ মানুষের হঠাৎ করে তিন হাজারে রূপান্তরিত হওয়া বিশ্বাসযোগ্য নয়। (এটি সম্ভব নয় যে, সাতশ মানুষ ছিল; তারা হঠাৎ করে তিন হাজার হয়ে গেছে, অথচ বাইরে থেকেও কেউ আসে নি।)

অপরদিকে এ বিষয়টিও বিশ্বাসযোগ্য নয় যে, ইসলামের উন্নতি সত্ত্বেও উহুদের (যুদ্ধের) দুবছর পর যুদ্ধ করতে সক্ষম মুসলমানদের সংখ্যা ততটাই থাকবে যতটা উহুদের সময় ছিল। (কিছু না কিছু সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে থাকবে।) কাজেই, এই দুটি বিষয় পর্যালোচনার পর ঐ রেওয়ায়েতটিই সঠিক বলে মনে হয় যে, আহযাবের যুদ্ধের সময় যুদ্ধ করতে সমর্থ মুসলামানের সংখ্যা প্রায় বারোশ ছিল। বাকি থাকলো এই প্রশ্ন যে, (তাহলে) কেউ তিন হাজার আবার কেউ সাতশ কেন লিখেছেন? এর উত্তর হচ্ছে, এই দুটি রেওয়ায়েত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। আহযাবের যুদ্ধের তিনটি অংশ ছিল। এর একটি অংশ ছিল তখন, যখন পর্যন্ত শত্রুরা মদীনার সামনে আসে নি কিন্তু পরিখা খনন করা হচ্ছিল। এক্ষেত্রে কমপক্ষে মাটি বহনের কাজ শিশুকিশোররাও করতে পারতো এবং কতক নারীও একাজে সাহায্য করতে পারতেন। কাজেই, যতক্ষণ পর্যন্ত পরিখা খননের কাজ চলছিল, মুসলমান সৈন্যের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। কিন্তু এতে শিশুকিশোররাও অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং মহিলা সাহাবীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে আমরা বলতে পারি, এ সংখ্যায় কিছু নারীও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা হয়ত পরিখা খননের কাজ করছিলেন না, কিন্তু ওপরের কাজে অংশগ্রহণ করে থাকবেন। তিনি (রা.) বলেন, এটি শুধু আমার ধারণাই নয় বরং ইতিহাস থেকেও আমার এ ধারণার সত্যায়ন হয়। যেমন লেখা আছে, যখন পরিখা খননের সময় আসে তখন সব ছেলেদেরও একত্রিত করা হয় এবং সকল পুরুষ– তা তিনি বড়ো হোন বা কিশোর, পরিখা খননে বা একাজে সাহায্য করছিলেন। অতঃপর যখন শত্রুরা এসে যায় এবং যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন মহানবী (সা.) পনেরো বছরের কম বয়সী কিশোরদের চলে যাবার নির্দেশ দেন। আর যারা পনেরো বছর বয়স্ক ছিল তাদেরকে অনুমতি দেন, চাইলে তারা থাকতেও পারে আবার চলেও যেতে পারে।

এই রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায়, পরিখা খননের সময় মুসলমানদের সংখ্যা বেশি ছিল এবং যুদ্ধের সময় সংখ্যা কমে যায়। কেননা অপ্রাপ্তবয়স্কদের ফেরত চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অতএব, যেসব রেওয়ায়েতে তিন হাজারের উল্লেখ এসেছে– তা পরিখা খননের সময়ের সংখ্যা বর্ণনা করে, যাতে ছোটো কিশোররাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর যেমনটি আমি অন্যান্য যুদ্ধ পর্যালোচনা করে অনুমান করেছি যে, কতক নারীও ছিলেন। (কেননা অন্যান্য যুদ্ধের রেওয়ায়েতে পাওয়া যে, নারীরাও অংশগ্রহণ করতেন;) কিন্তু বারোশ সংখ্যাটি সেই সময়কার যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষরা (যুদ্ধক্ষেত্রে) রয়ে গিয়েছিলেন। এখন বাকি থাকলো এই প্রশ্ন যে, তৃতীয় রেওয়ায়েত, যা সাতশ সৈন্যের উল্লেখ করে– সেটিও কি সঠিক? (তিন হাজার থেকে বারোশর কথা তো মেনে নিলাম। এখন দেখতে হবে সাতশর রেওয়ায়েতটিও সঠিক কি-না।) এর উত্তর হলো, ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন যিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবিদ এবং ইবনে হাযমের মতো প্রতিথযশা আলেমও দৃঢ়ভাবে তার সত্যায়ন করেছেন। তাই এ সম্পর্কেও সন্দেহ করা যায় না; (এটিও সঠিক হবে।) আর এর সত্যায়ন এভাবেও হয় যে, গভীরভাবে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, যুদ্ধাবস্থায় বনু কুরায়যা যখন কাফির সেনাদলে যোগ দেয় এবং তারা মদীনায় অতর্কিত আক্রমণ করার দুরভিসন্ধি করে আর তাদের গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায়, তখন মহানবী (সা.) মদীনার ঐ দিকটির সুরক্ষা করাও আবশ্যক জ্ঞান করেন যে–দিকে বনু কুরায়যা বসবাস করতো। এই দিকটি পূর্বে এ চিন্তা করে অরক্ষিত রাখা হয়েছিল যে, বনু কুরায়যা আমাদের মিত্র, তারা শত্রুকে এদিক দিয়ে আসতে দেবে না। অতএব, ইতিহাস থেকে জানা যায়, বনু কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতার কথা যখন জানা যায়, (যখন তাদের সম্পর্কচ্ছেদের কথা জানা যায়, তাদের প্রতারণার কথা জানা যায়,) যেহেতু বনু কুরায়যার ওপর বিশ্বাস করে (মুসলমান) নারীদেরকে সেই এলাকায় রাখা হয়েছিল যেখানে বনু কুরায়যার দুর্গ ছিল এবং তারা অনিরাপদ ছিল, (তাই) এ পর্যায়ে মহানবী (সা.) তাদের সুরক্ষা আবশ্যক জ্ঞান করেন এবং মুসলমানদের দুটি সৈন্যদল প্রস্তুত করে মহিলাদের অবস্থানের উভয় অংশে মোতায়েন করেন। মাসলামাহ্ ইবনে আসলাম (রা.)-কে দুইশ সাহাবীসহ এক জায়গায় নিযুক্ত করেন এবং যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে তিনশ সাহাবীসহ অন্য জায়গায় নিযুক্ত করেন এবং নির্দেশ দেন, অল্প কিছুক্ষণ বিরতির পর পর (তারা যেন) উচ্চৈঃস্বরে তকবীর দিতে থাকেন যেন বুঝা যায় যে, নারীরা নিরাপদ বা সুরক্ষিত আছেন। এই রেওয়ায়েতের আলোকে আমাদের এই সমস্যারও সমাধান হয়ে যায় যে, ইবনে ইসহাক পরিখার যুদ্ধে কেন সাতশ সৈন্যের কথা বলেছেন। কেননা, বারোশ সৈন্যের মধ্যে যখন পাঁচশ সৈন্যকে নারীদের সুরক্ষার জন্য পাঠানো হয় তখন বারোশ সৈন্যের মধ্যে মাত্র সাতশ অবশিষ্ট থেকে যায়, আর এভাবে পরিখার যুদ্ধের সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন ইতিহাসে যে তীব্র মতভেদ পাওয়া যায় তার সমাধান হয়ে যায়।

মুশরিকদের মদীনায় পৌঁছার এবং তৎপরবর্তী পরিস্থিতির বিশদ বিবরণও বর্ণিত হয়েছে যে, আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মক্কার কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের সেনাদল মদীনায় পৌঁছে এবং মদীনার চতুষ্পার্শ্বে শিবির স্থাপন করে। মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এর বিশদ বিবরণ এভাবে বর্ণনা করেছেন যে,

কমপক্ষে বিশ দিন অথবা আরেকটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী ছয়দিন সকাল-সন্ধ্যা নিরন্তর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই বিশাল পরিখা (খনন) সম্পন্ন হয়। আর এই অতিশয় কঠোর পরিশ্রম সাহাবীদেরকে একেবারে ক্লান্ত-শ্রান্ত করে দেয়। যাহোক, একদিকে (খননের) এই কাজ সম্পন্ন হয় আর অন্যদিকে আরবের ইহুদী ও মুশরিকরা সৈন্যসামন্তের সংখ্যা ও শক্তির নেশায় বুঁদ হয়ে মদীনার প্রান্তে উপস্থিত হয়। সর্বপ্রথম আবু সুফিয়ান উহুদ পর্বত অভিমুখে অগ্রসর হয়। কিন্তু সেই জায়গাটিকে নির্জন ও জনমানবশূন্য দেখে মদীনার সেই দিকে অগ্রসর হয়, যেটি শহরের ওপর আক্রমণের জন্য উপযুক্ত ছিল; কিন্তু এর সামনে পরিখা খনন করা হয়েছিল। যখন কাফিরদের সৈন্যদল এখানে পৌঁছে তখন পরিখাকে তাদের পথে প্রতিবন্ধক দেখে তারা সবাই বিস্মিত ও চিন্তিত হয় এবং পরিখার ওপারে উন্মুক্ত প্রান্তরে শিবির স্থাপন করতে বাধ্য হয়। অপরদিকে কাফির সৈন্যবাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে মহানবী (সা.) তিন হাজার মুসলমানকে সাথে নিয়ে শহর থেকে বের হন এবং পরিখার নিকটে পৌঁছে শহর ও পরিখার মাঝখানে সালাহ্ পর্বতকে নিজের পেছনদিকে রেখে শিবির স্থাপন করেন। আর পরিখাটি যেহেতু অনেক প্রশস্ত ছিল না এবং কোনো কোনো অংশ অবশ্যই এমন ছিল যে, শক্তিশালী ও অভিজ্ঞ অশ্বারোহী (তার ওপর দিয়ে) লাফিয়ে শহরের দিকে আসতে পারতো; এছাড়া মদীনার সেসব দিক যেখানে (কোনো) পরিখা ছিল না বরং শুধু বাড়িঘর, বাগবাগিচা এবং শিলাখণ্ডের প্রতিবন্ধকতা ছিল, সেদিকের সুরক্ষা করাও আবশ্যক ছিল যেন শত্রু ওদিক দিয়ে বাড়িঘরের ক্ষতি করে কিংবা অন্য কোনো কৌশলে অল্প সংখ্যক মানুষ লাইন ধরে শহরে (প্রবেশ করে) আবার আক্রমণ করে না বসে– তাই মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে পরিখার বিভিন্ন অংশে এবং মদীনার অন্যান্য প্রান্তের উপযুক্ত স্থানে নিরাপত্তা চৌকি বসান আর জোরালো তাগিদ দিয়ে বলেন, দিন হোক বা রাত– কোনো সময়েই এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেন অলস কিংবা উদাসীন না হয়। অপরদিকে কাফিররা যখন দেখে যে, পরিখার মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতার কারণে উন্মুক্ত প্রান্তরে রীতিমত যুদ্ধ করা অথবা শহরের ওপর সর্বাত্মক আক্রমণ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে তখন তারাও অবরোধের আদলে মদীনাকে ঘিরে ফেলে আর পরিখার দুর্বল অংশগুলো দিয়ে স্বার্থ উদ্ধারের সুযোগ সন্ধান করতে থাকে।

যাহোক, শত্রু যখন পরিখা অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয় তখন ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে থাকে। এর বিশদ বিবরণ ইতিহাসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মুশরিকরা মদীনার চতুষ্পার্শ্বে অবরোধ করে ফেললেও, পূর্ণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তারা কোনো দিক দিয়েই পরিখা পার হতে পারে নি আর

মুসলমানদের ওপর সরাসরি আক্রমণও করতে পারে নি। এমন নিরূপায় এবং অসহায় অবস্থা দেখে আবু সুফিয়ান আর বনু নযীরের নেতা হুয়ী বিন আখতাব প্রমুখ আরেকটি ষড়যন্ত্র আঁটে যে, মদীনার অভ্যন্তরে বসবাসরত ইহুদী গোত্র বনু কুরায়যাকে যে–কোনো উপায়ে সম্মত করানো হোক, তারা যেন মুসলমানদের সাথে কৃত সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে এবং আমাদের সাথে যোগ দেয় আর তারা ভেতর থেকে যেন মদীনাবাসীদের ওপর আক্রমণ করে। অতএব, এই ভয়ানক ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হুয়ী বিন আখতাব বনু কুরায়যার নেতা কা'ব বিন আসাদ কুরায়যীর কাছে আসে। কা'ব যখন তার আগমনের সংবাদ পায় তখন সে দুর্গের (মূল) ফটক বন্ধ করে দেয়। হুয়ী ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে কা'ব ফটক খুলতে অস্বীকৃতি জানায়। হুয়ী ডাক দিয়ে বলে, হে কা'ব! তোর অনিষ্ট হোক, ফটক খুলে দে। কা'ব বলে, হে হুয়ী! তুই (একজন) দুষ্ট মানুষ। আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে সন্ধিচুক্তি করেছি। আমি সেই চুক্তি ভঙ্গ করবো না আর আমি মুহাম্মদ (সা.)-কে সর্বদা সত্যবাদী এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী পেয়েছি। (এক দিকে এই বিবৃতি দেয়, কিন্তু পরবর্তীতে গিয়ে বদলে যায়।) এরপর সে বলে, ফটক খোল, তোর সাথে আমি কিছু কথা বলবো। কা'ব বলে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এ কাজ করব না। কিন্তু কিছুটা পীড়াপীড়ির পর অবশেষে কা'ব ফটক খুলে দিলে হুয়ী বলে, হে কা'ব! তোর সর্বনাশ হোক, আমি তোর কাছে যুগের সকল সম্মান এবং (আছড়ে পড়া) উত্তাল সমুদ্র নিয়ে এসেছি। আমি তোর কাছে কুরাইশের নেতৃবৃন্দ এবং গোত্রপ্রধানদের নিয়ে এসেছি। আর সে ঐসব গোত্রের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে যারা তাদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে মদীনার চতুর্দিক থেকে মুসলমানদের অবরুদ্ধ করে রেখেছিল আর পাশাপাশি একথাও বলে যে, আমরা পরস্পর দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার করেছি যে, এবার এখান থেকে মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীসাথিদের সমূলে বিনাশ না করে ফিরে যাব না আর আমরা এতে সফলও হতাম যদি আমাদের পথে এই পরিখা বাধ না সাধতো। কিন্তু এসব কথা শুনেও বনু কুরায়যার নেতা কা'ব চুক্তি ভঙ্গ করতে সম্মত হয় নি। বরং সে বলে, আল্লাহ্‌র কসম! তুই আমার কাছে এ যুগের লাঞ্ছনা ও এমন মেঘ নিয়ে এসেছিস যার মাঝে কোনো পানি নেই। এটি কেবল গর্জন ও বিদ্যুৎ চমক দেখায়, এর মাঝে কিছুই নেই। হে হুয়ী! তুই ধ্বংস হ, আমাকে আমার মতো থাকতে দে, কেননা আমি মুহাম্মদ (সা.)-কে সর্বদা সত্যভাষী এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী পেয়েছি। {বার বার এ কথাই বলছিল যে, মহানবী (সা.) সত্যবাদী এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী।} তিনি আমাদের ওপর কোনোরূপ বল প্রয়োগ করেন না আর আমাদের ধর্মের বিষয়ে কোনোরূপ হস্তক্ষেপও করেন না। তিনি আমাদের উত্তম প্রতিবেশী। অতএব, তুই ফেরত চলে যা। পাছে আমাদের পরিণতিও আবার তদ্রুপ হয়, যেমনটি আমাদের পূর্বে তোদের হয়েছে। কিন্তু হুয়ী কা'বকে প্ররোচিত ও বিভ্রান্ত করতে থাকে, এমনকি সে নিজের গোত্র এবং বনু কায়নুকার দুঃখকষ্ট এবং বিপদাবলির উল্লেখ করে। (ভাবটা এমন) যেন এই মুসলমানদের কারণেই আমাদের এসব দুঃখকষ্ট হচ্ছে। এমনকি অবশেষে সে কা'বের হৃদয় নরম

করতে সফল হয় আর কা'বও পরিশেষে তার প্রতারণরা ফাঁদে পা দেয়, তার প্রকৃতিতে নিহিত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য পায় এবং হুয়ীকে সে বলে, ঠিক আছে, ধরো আমি যদি তোমার কথা মেনে নিলাম; কিন্তু কুরাইশ এবং গাতাফান যদি ফেরত চলে যায় এবং মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে আমাদের কী হবে? তখন হুয়ী বলে, তুমি চিন্তিত হয়ো না, এমন পরিস্থিতিতে আমি তোমার সাথে তোমার দুর্গে প্রবেশ করবো এবং যে বিপদ তোমার ওপর আসবে সেটা আমার ওপরও আসবে। এসব কথাবার্তা বা শলাপরামর্শের পর অবশেষে কা'ব বিন আসাদ মহানবী (সা.)-এর সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে। এ সময়ে কা'বের সঙ্গী আমর বিন সওদা তাকে হিতোপদেশ দেয় এবং তাকে এই অপকর্মের (পরিণাম) সম্পর্কে সতর্ক করে। আর তাকে মহানবী (সা.)-এর সুদৃঢ় চুক্তির কথা স্মরণ করায় এবং তাকে বলে, যদি তুমি মুহাম্মদ (সা.)-কে সাহায্য না করো তাহলে তাঁকে এবং তাঁর শত্রুদের ছেড়ে দাও, কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে বিরোধী আক্রমণকারীদের সঙ্গ দিও না। কিন্তু সে (মানতে) অস্বীকার করে। এই অবস্থা দেখে বনু কুরায়যার কতিপয় পুণ্যবান ইহুদী ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে চলে যায় এবং ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বনু কুরায়যার চুক্তি ভঙ্গের সংবাদ পান, তিনি মহানবী (সা.)-কে তা অবহিত করেন, তখন তিনি (সা.) সা'দ বিন মুআয ও সা'দ বিন উবাদা (রা.)-কে প্রেরণ করেন। এই দুজন তাদের জাতির নেতা ছিলেন এবং এই দুজনের সাথে আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) এবং খওয়াত বিন জুবায়ের (রা.)-কেও প্রেরণ করেন। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.)-কেও সাথে পাঠান আর বলেন, তোমরা যাও এবং গিয়ে দেখো, এই জাতি সম্পর্কে আমরা যে সংবাদ পেয়েছি তা সত্য কি-না? যদি এই সংবাদ সত্য হয় তাহলে সবার সামনে একথা বলবে না বরং ইঙ্গিতে আমাকে বলবে, যেন আমি জানতে পারি এই সংবাদ সত্য। আর যদি তারা এই চুক্তিতে বহাল থাকে এবং এই সংবাদ মিথ্যা হয় তাহলে এই কথা প্রকাশ্যে সবার সামনে বলে দিও। অতএব, এই প্রতিনিধি দল বনু কুরায়যার নিকট যায়। সেখানে যখন কা'ব এবং তার সঙ্গীদের সাথে কথা হয়, তখন তাদের আচার-ব্যবহারই বদলে গিয়েছিল। যখন কা'বকে বলা হয় যে, তুমি মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ; তখন সে চরম অবজ্ঞাভরে বলে, কোন রসূল? আমাদের কোনো চুক্তি নেই। আমি এই চুক্তিকে এভাবে ছিঁড়ে ফেলেছি যেভাবে জুতার ফিতা ছিঁড়ে ফেলা হয়। বিভিন্ন রেওয়ায়েত অনুযায়ী এই সময়ে উভয়পক্ষের মাঝে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ও হয়। যাহোক, এই প্রতিনিধি দল ফিরে আসে এবং তারা ইশারা-ইঙ্গিতে মহানবী (সা.)-এর সমীপে (আসল ঘটনা) বর্ণনা করেন। এমন স্নায়ু-বিধ্বংসী ও চৈতন্য লোপ পাওয়ার মতো পরিস্থিতিতে মহানবী (সা.) কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। (তাঁর ওপর কোনো প্রভাব পড়ে নি। সাধারণ মানুষের তো চৈতন্য লোপ পেত।) তিনি (সা.) বলেন, **'আবশিরু ইয়া মা'শারাল মুমিনীনা বিনাসরিল্লাহি তা'লা ওয়া আওনিহি'** অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীদের দল! আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের সুসংবাদে আনন্দিত হও। এরপর

বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একটা সময় আসবে যখন আমি কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ করবো এবং এর চাবিগুলো আমার হাতে থাকবে আর কিসরা ও কায়সার (অর্থাৎ পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য) অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে আর তাদের ধনসম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা হবে।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বনু কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেন, আবু সুফিয়ান এই কৌশল অবলম্বন করে যে, বনু নযীরের ইহুদী নেতা হুয়ী বিন আখতাবকে এই নির্দেশ দেয়, সে যেন রাতের আঁধারে বনু কুরায়যার দুর্গ অভিমুখে যায় এবং তাদের নেতা কা'ব বিন আসাদের সাথে সাক্ষাৎ করে বনু কুরায়যাকে নিজের দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করে। তদনুযায়ী হুয়ী বিন আখতাব সুযোগ বুঝে কা'বের বাড়িতে যায়। প্রথমে তো কা'ব তার কথা শুনতেই চাচ্ছিল না এবং বলে যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে আমাদের শান্তিচুক্তি রয়েছে আর মুহাম্মদ (সা.) সর্বদা নিজের অঙ্গীকার ও সন্ধিচুক্তি বিশ্বস্ততার সাথে রক্ষা করেছেন বিধায় আমি তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না। কিন্তু হুয়ী তাকে এমন প্রলোভন দেখায় এবং ইসলামের আসন্ন ধ্বংসের বিষয়ে আশ্বস্ত করে আর নিজের এই অঙ্গীকার অর্থাৎ, আমরা ইসলামকে নির্মূল না করা পর্যন্ত মদীনা থেকে ফিরে যাবো না– এত দৃঢ়ভাবে উপস্থাপন করে যার ফলে অবশেষে সে সম্মত হয়ে যায়। আর এভাবে বনু কুরায়যার শক্তির পাল্লা সেই পাল্লার সাথে মিলে যায় যা প্রথম থেকেই অনেক ভারী ছিল। (অর্থাৎ, সেই কাফিরদের সংখ্যা তো প্রথম থেকেই অনেক বেশি ছিল এবং ইহুদীদের চুক্তিভঙ্গের কারণে সেইসাথে তাদের শক্তি আরও বেড়ে যায়।) মহানবী (সা.) যখন বনু কুরায়যার এই ভয়ংকর বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়ে জানতে পারেন তখন প্রথমে দু-তিন বার তিনি (সা.) গোপনে যুবায়ের ইবনুল আওয়ামকে প্রকৃত বিষয় জানার জন্য পাঠান। পরবর্তীতে অওস ও খাযরাজ গোত্রের প্রধান সা'দ বিন মুআয এবং সা'দ বিন উবাদা (রা.)সহ আরও কয়েকজন প্রভাবশালী সাহাবীকে বনু কুরায়যার কাছে একটি প্রতিনিধি দল হিসাবে প্রেরণ করেন। আর তাদেরকে জোরালোভাবে নির্দেশ দেন, কোনো উদ্‌বেগজনক সংবাদ পেলে ফিরে এসে যেন তা প্রকাশ্যে বর্ণনা না করে, বরং আকার–ইঙ্গিতে তা বুঝায়, যেন মানুষের মাঝে উদ্‌বেগ সৃষ্টি না হয়। এই প্রতিনিধি দল যখন বনু কুরায়যার বাড়িতে পৌঁছায় এবং তাদের গোত্রপ্রধান কা'ব বিন আসাদের নিকট যায় তখন সেই হতভাগা তাদের সাথে চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভঙ্গিতে সাক্ষাৎ করে। আর উভয় সা'দের পক্ষ থেকে চুক্তির কথা উল্লেখ করা হলে সে এবং তার গোত্রের লোকেরা বিরক্তির সুরে বলে, যাও! মুহাম্মদ (সা.) এবং আমাদের মাঝে কোনো চুক্তি নেই। এই বাক্য শুনে সেই প্রতিনিধি দল সেখান থেকে উঠে চলে আসে। আর সা'দ বিন মুআয এবং সা'দ বিন উবাদা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞার সাথে তাঁকে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন।

অনেক মানুষ, এমনকি আমাদের (জামা'তের) যুবকরাও অন্যদের কাছ থেকে শুনে এই প্রশ্ন করে বসে যে, বনু কুরায়যার প্রতি সে সময় কেন নির্যাতন চালানো হয়েছিল? তারা চুক্তিভঙ্গ করেছিল বিধায় তাদেরকে এর শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে তাদের ওপর কোনো নির্যাতন চালানো হয় নি। যাহোক, এ সম্পর্কে আরও বিশদ বিবরণ রয়েছে এবং হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এর উল্লেখ আগামীতে করব, ইনশাআল্লাহ্।

আজ থেকে খোদ্দামুল আহমদীয়া (যুক্তরাজ্যের) ইজতেমাও আরম্ভ হচ্ছে। খোদ্দামরা এ থেকে পরিপূর্ণরূপে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করুন, যদিও আবহাওয়ার পূর্বাভাস হচ্ছে– হয়ত বৃষ্টি হতে থাকবে। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন এবং সুন্দরভাবে তাদের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হোক। এ দিনগুলোতে খোদ্দাম সদস্যরা আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানগত মান বৃদ্ধিরও চেষ্টা করুন। যে–সব দোয়া ও দরূদের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম এবং এর তাহরীক করেছিলাম– এ দিনগুলোতে এদিকেও বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন আর সর্বদা পাঠ করতে থাকুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে সকল প্রকার শয়তানী আক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখুন।

আজ আমি (কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির) গায়েবানা জানাযাও পড়াবো; তাদের স্মৃতিচারণ করছি। প্রথম স্মৃতিচারণ হলো, রাবওয়া নিবাসী মোহতরম হাবীবুর রহমান যিরভী সাহেবের যিনি সম্প্রতি ৭৩ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন এবং ওয়াকেফে যিন্দেগী ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল সূফী খোদা বখশ যিরভী। তাদের বংশে তার পিতা সূফী খোদা বখশ যিরভী সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াতের সূচনা হয়, যিনি ১৯২৮ সালে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। হাবীবুর রহমান যিরভী সাহেব প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাইব্রেরি সায়েন্সে এমএসসি করেন। ১৯৮১ সালে তিনি জীবন উৎসর্গ করেন এবং তার ওয়াক্ফ গৃহীত হয়। এরপর ১৯৮১ সালে সহকারী লাইব্রেরিয়ান হিসেবে তার পদায়ন হয়। তারপর তিন-চার বছর খিলাফত লাইব্রেরির ইনচার্জ হিসেবেও সেবা করার তৌফিক লাভ করেন। এরপর নাযারাত ইশায়াতে তার পদায়ন হয়, অতঃপর তাহের ফাউন্ডেশনে নিযুক্ত হন আর বর্তমানে তিনি সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নায়েব নাযের দিওয়ান হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করছিলেন। খোদ্দামুল আহমদীয়াতেও তিনি মুহতামিম হিসেবে বিভিন্ন বিভাগে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। মজলিস আনসারুল্লাহ্তেও তিনি কেন্দ্রীয় কায়েদ হিসেবে সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। তিনি কঠোর পরিশ্রম করে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখিত বিভিন্ন পুস্তকাদি থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনচরিত একত্রিত করে একটি পুস্তক আকারে সংকলন করেছেন যা **'তাযকারে মাহদী'** নামে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া অসংখ্য পাণ্ডুলিপির কাজ করছিলেন যার মধ্যে কয়েকটি বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাকে এক পুত্র

ও দুই কন্যা দান করেছেন। খিলাফতের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। খুবই শান্ত স্বভাবের এবং নিজের কাজের প্রতি মনোযোগী ছিলেন। তার প্রতি যে দায়িত্বই অর্পণ করা হতো তা সুচারুরূপে পালন করতেন। সর্বদা ওয়াক্‌ফের দাবি পূর্ণ করেছেন এবং পাগলপারা হয়ে কাজ করেছেন। খুবই মিশুক ও প্রফুল্লচিত্তের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন, তার সন্তানদেরও পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তৌফিক দিন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ ডাক্তার সৈয়্যদ রিয়াযুল হাসান সাহেবের, তিনিও সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসী ছিলেন। তিনি ব্রিগেডিয়ার ডাক্তার যিয়াউল হাসান সাহেবের পুত্র ছিলেন। এরপর তিনি জীবন উৎসর্গ করেন এবং ডাক্তার হিসেবে সেবা করতে থাকেন। শৈশব থেকেই জামা'তের সেবা করে আসছেন। মজলিস নুসরত জাহাঁ-র অধীনে প্রায় বিশ বছরের অধিক সময় ধরে উগান্ডা, কেনিয়া, গাম্বিয়া এবং পাকিস্তানে অনেক সেবা করার তৌফিক লাভ করেছেন। কেনিয়ায় কয়েক বছর সেবা প্রদানের পর তিনি কেনিয়া থেকে স্পেশালাইজেশন এবং জেনারেল সার্জন প্রশিক্ষণের জন্য পাকিস্তানে আসার অনুমতি চেয়েছিলেন। সেখান থেকে চলে যান এবং বিভিন্ন মেডিকেল ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট অর্জন করেন। তিনি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারদের এ্যানাটমি পড়ানোরও সৌভাগ্য লাভ করেন। খুবই অভিজ্ঞ ডাক্তার ছিলেন। গাম্বিয়ায় স্থানীয় ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য করতেন। তাদেরকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করতেন, চাকরি খুঁজতে তাদেরকে সাহায্য করতেন। দরিদ্র ও অভাবীদের আর্থিক সাহায্য করতে সদা প্রস্তুত থাকতেন। তার এটিও একটি বিশেষ গুণ ছিল যে, তিনি অনেক দোয়া করতেন এবং নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তেন। যুবক বয়স থেকেই তার তাহাজ্জুদ পড়ার অভ্যাস ছিল। তার পরিচিতরা লিখেছেন, অত্যন্ত মিশুক, রোগীদের প্রতি সত্যিকার স্নেহ, সহানুভূতি এবং ভালোবাসা রাখতেন। পরিশ্রমী, উদ্যমী, খোদার ওপর পরিপূর্ণ নির্ভরশীল মানুষ ছিলেন। দোয়ার প্রতি মনোযোগী এবং মানবহিতৈষী সত্তা ছিলেন। তার ব্যক্তিত্বে নম্রতা, বিনয় এবং সেবার অফুরন্ত স্পৃহা ছিল। অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। ওয়াকেফে যিন্দেগীদের অনেক সম্মান করতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ ব্যবহার করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ রাবওয়া নিবাসী মুকাররম অধ্যাপক আব্দুল জলীল সাদেক সাহেবের; তিনি সম্প্রতি ৮০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনিও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসী ছিলেন। তিনি রাবওয়ার কুরাইশী আব্দুল গনী সাহেবের পুত্র ছিলেন। তার বংশে তার দাদা গুজরাট জেলার গোলেকী নিবাসী হযরত মিয়াঁ কুতুব উদ্দীন সাহেব এবং নানা ডেরা গাজী খান জামা'তের আমীর মৌলভী মুহাম্মদ উসমান সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াতের সূচনা হয়। জলীল সাদেক সাহেব রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ বা স্নাতকোত্তর করেন। এরপর ১৯৬৪ সালে তা'লীমুল ইসলাম কলেজে শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯৬৬ সালে পুনরায় তিনি ইংরেজিতে এমএ করেন। এরপর রীতিমতো তা'লীমুল ইসলাম

কলেজের ইংরেজি বিভাগে পদায়ন হয়। টানা ৩৯ বছর পর্যন্ত পড়ানোর দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। (হুযূর বলেন,) আমি নিজেও কলেজে তার ছাত্র ছিলাম। খুবই শান্ত স্বভাবের এবং স্নেহের সাথে পাঠদানকারী শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রদের সাথে খুবই ভালো সম্পর্ক রাখতেন এবং ছাত্রদের সম্মান করতেন। অবসরের পর তিনি ২০০৩ সালে জীবন উৎসর্গ করেন এবং সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার তরতীব ও রেকর্ড বিভাগের ইনচার্জ হিসেবে তার পদায়ন হয়, যেখানে তিনি নায়েব নাযের ছিলেন। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার মুহতামিম হিসেবে বিভিন্ন স্থানে তার সেবা করার সুযোগ হয়। তিনি পাকিস্তানের মজলিসে সেহত-এর সভাপতিও ছিলেন। এরপর ১৯৮৩ সাল থেকে তিনি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় কাযা বোর্ডের কাযীও ছিলেন। নিজের হালকার প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালনের তৌফিক লাভ করেন। তার দুই কন্যা এবং এক পুত্র রয়েছে। তার সম্পর্কে স্মৃতিচারণকারীদের একজন যথার্থই লিখেছেন যে, তিনি অত্যন্ত পরিশীলিত প্রকৃতির দরবেশ স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় নীরব থাকতে পছন্দ করতেন। কিন্তু যখন কথা বলতেন– সর্বদা বুঝেশুনে, হিসেব করে এবং যাচাই-বাছাই করে কথা বলতেন। পবিত্র ও সহনশীল চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি অনধিকার চর্চা করতেন না। যেখানে প্রয়োজন হতো অবশ্যই উত্তম পরামর্শ প্রদান করতেন। পুণ্যকাজে উৎসাহ প্রদান করতেন। কখনো কারও দ্বারা কষ্ট পেলে অভিযোগ করতেন না। পরম ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ এবং স্বল্পেতুষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। অসহায়–অভাবীদেরকে নীরবে এবং গোপনে নিয়মিত আর্থিক সাহায্য করতেন। খিলাফতের সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল, তিনি নিয়মিত পত্র লিখতেন। তার পারিবারিক জীবনও অত্যন্ত সুমধুর ছিল; বাড়িতেও এবং স্ত্রীর সাথেও। এছাড়া পিতামাতার সেবক এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানকারী ছিলেন; বরং তার ভাই লিখেছেন, ভাইবোনদেরও অনেক খেয়াল রাখতেন এবং একান্ত আবশ্যিক দায়িত্ব জ্ঞান করে তাদের সেবা করতেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ ঝং নিবাসী মুকাররম মাস্টার মুনীর আহমদ সাহেবের। তিনিও সম্প্রতি ৮২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনিও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসী ছিলেন। তার পিতা মিয়াঁ গোলাম মুহাম্মদ সাহেব ১৯৩০ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র হাতে বয়আত করেছিলেন। মাস্টার সাহেব জন্মগত আহমদী ছিলেন। খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং আনসারুল্লাহ্তে তিনি চল্লিশ বছর সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। ঝং-এর জেলা কায়েদ এবং জেলা নাযেম ছিলেন। পরবর্তীতে চিনিউট জেলা হবার পর সেখানকারও (নাযেম) ছিলেন। জামা'তের অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও নিবেদিতপ্রাণ সেবক ছিলেন এবং মানবহিতৈষী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক হিসেবে ঝং-এ চাকরি করেছেন আর তার হাজার হাজার ছাত্র আছে, যারা তাকে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন। তিনি মানুষের অনেক উপকারে আসতেন। সরকারি দপ্তরে যাবার ক্ষেত্রে তিনি মানুষের, বিশেষভাবে আহমদীদের অনেক উপকার করতেন আর তাদের কাজে কেবল সহযোগিতাই করতেন না, বরং নিজের

বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাদের আতিথেয়তাও করতেন। তার সম্পর্কের পরিধি অনেক বিস্তৃত ছিল এবং সেসব সম্পর্ককে জামা'ত এবং জামা'তের সদস্যদের সেবায় ব্যবহার করতেন। এমন নয় যে, ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতেন। আহমদী কারাবন্দি হোক বা অ-আহমদী– তাদের কল্যাণে ও সেবায় সচেষ্ট থাকতেন। জেলখানার কর্মকর্তাদের সাথে তার ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ছিল যার মাধ্যমে তিনি জামা'তের কারাবন্দিদের কল্যাণ প্রদানে সচেষ্ট থাকতেন। জেলখানায় সুযোগসুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে তার ব্যাপক যোগাযোগ ছিল। (হুযূর বলেন,) যখন আমরা অর্থাৎ আমি ও আমার সাথিরা জেলে ছিলাম, সে সময়ও তিনি আমাদের অনেক সেবা করেছেন আর সে সময় জেলারের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকার কারণে আমাদের জন্য অনেক সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন– যা সাধারণ বন্দিদের সরবরাহ করা হয় না। আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এমন নয় যে, তিনি কেবল বিশেষ ব্যক্তির সেবা করতেন, বরং তিনি ধনী-দরিদ্র প্রত্যেক আহমদীর সেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন এবং সাধারভাবেও বন্দিদের কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করতেন। কাদিয়ানের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ছিল। প্রায় প্রতি বছর তিনি কাদিয়ান যেতেন এবং সেখানে ডিউটিতেও যোগদান করতেন। আর তার জেলার কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা যখন তার জেলা পরিদর্শনে যেতেন তখনও তাদেরকে ষোলোআনা সহযোগিতা করতেন। ১৯৮৮ সালে তার বিরুদ্ধে লিফলেট বিতরণের কারণে একটি মামলাও দায়ের করা হয়েছিল কিন্তু যাহোক, পরবর্তীতে তা খারিজ হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন এবং তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার কোনো সন্তানাদি ছিল না।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)